# পাঠ : আদরিণী
# প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

**বাঙালি কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়:-**

বাংলা ছোটগল্প তখনো প্রভাতকাল অতিক্রম করে মধ্যাহ্নে পৌঁছেনি, উন্মেষের পর বিকাশ পর্বের ভাঙা-গড়ার কাল-এসময়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব ঔপন্যাসিক ও কথাসাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ও তাঁর স্বকালের লেখক হয়েও প্রভাতকুমার নিজেকে স্বাতন্ত্র্য করে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত হতে পেরেছিলেন। সাহিত্যজীবনের শুরুতেই প্রভাতকুমার কবি হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে গদ্য লিখতে উৎসাহিত করেন। তাঁর স্নেহে , উপদেশে, উৎসাহে প্রভাতকুমার হয়ে ওঠেন বাংলা সাহিত্যের সফল ও দক্ষ গদ্যকার।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ভাব, প্রাচুর্যের সমৃদ্ধি, উচ্ছ্বাসের প্রবল স্রোত সহজে লক্ষণীয়-এ দিক থেকে প্রভাতকুমার ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি গল্পে ভাব-উচ্ছ্বাসকে কমিয়ে তুলে ধরেছেন নিরেট বাস্তবকে , যা দেখেছেন তা-ই শৈল্পিকরূপে বুনেছেন গল্পের জমিনে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'রবীন্দ্র-কবিমানসের স্বমন্দাকিনীই ছোটগল্পে মর্ত্যভাগীরথীরূপে মানুষের কাছে আনন্দ-বেদনায় কলনাদিনী , তাই তাঁর পাবনপ্রবাহে মৃৎপুত্তলিকাও ক্ষণে ক্ষণে দেবতার অমর মহিমায় দীপ্তমান। প্রভাতকুমারের যমুনা মৃত্যু সহোদরা কালিন্দী , তাঁর নির্মল জলে পার্থিব জীবনেরই স্বমহিমচ্ছায়া প্রতিবিম্বিত। ' সূক্ষ্ম জীবনবোধের কারণেই রবীন্দ্রনাথের কালে থেকেও বিপুল পাঠকপ্রিয়তা পেতে প্রভাতকুমারের এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। বিচিত্রমুখী গল্পের জন্য তিনি সমকালেই খ্যাত হয়েছিলেন 'বাংলার মোপাসাঁ' নামে।

প্রভাতকুমার মানুষের হৃদয়ে নীরবে বয়ে চলা প্রেম-মমতার ফল্গুধারাটুকু সযত্নে ধরতে চেষ্টা করেছেন , তাঁর কাছে স্নেহ-মায়াই ছিল পরম মহার্ঘ, বহুল কাঙ্ক্ষিত। তাই প্রেম-মমতা নামের মুদ্রার উল্টো পিঠ তাঁর গল্পে কখনো উঠে আসেনি। গল্প পরিবেশনে ছিলেন বাঙালির জাতকথক ; নিপুণ বর্ণনা, সংলাপের মাধুর্য ও চরিত্র-চিত্রণে প্রতিটি গল্পেই প্রভাতকুমার হাজির করতেন ভিন্নধর্মী কোনো চরিত্রকে-এসব চরিত্র কখনো দেশের সীমানা ডিঙিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে , আবার কখনো বহির্দেশের মানুষ তাঁর গল্পে এসে পড়েছে অতিথির মতো।

মানবতার দীক্ষায় দীক্ষিত, জীবনধর্মে আলোকিত-সমাজসচেতন শিল্পী প্রভাতকুমার স্বগোত্রীয় কুসংস্কারকে মর্মমূলে উপলব্ধি করেছেন। এসব অনাচার, ধর্মান্ধতার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বেশ কিছু গল্পে , এ ক্ষেত্রে 'দেবী' গল্পটি স্মরণযোগ্য। প্রভাতের গল্পের জগৎ কতটা সমৃদ্ধ , গদ্যে তিনি কতটা সাবলীল পদব্রাজক- 'দেবী' পাঠে তা সহজে অনুমেয়। সমাজের অনাচারগুলো কিভাবে বিশ্বাসে রূপ নেয়, আসন গাড়ে হৃদয়ে এবং একসময় যে এসব ঠুনকো বিশ্বাস ভেঙে অতলের দিকে পতিত হয়-তা এ গল্পে আলেখ্য। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রভাতকুমার অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। দেবী গল্পের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টি পরবর্তী সময়ে আমরা তারাশঙ্করের 'ডাইনি' গল্পের মধ্যে খুঁজে পাই। গল্পটির মেদহীন কাহিনীতে প্রথম দর্শনে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় দয়াময়ী ও উমাপ্রসাদের দাম্পত্য জীবন , যে জীবনে তারা কল্পলোকের স্বপ্নসারথি। কাহিনীর বিকাশ ঘটে যখন দয়াময়ীর শ্বশুর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দয়াময়ীকে 'দেবী' বলে আখ্যা দেয়। দয়াময়ীর প্রিয় 'খোকা' অসুস্থ হলে তাকে ডাক্তার দেখানো হয় না। কারণ দয়াময়ীর নিজের বিশ্বাস-সে অলৌকিক ক্ষমতাধারী, দেবী-সে-ই সহজে খোকাকে সারিয়ে তুলতে পারবে। কিন্তু এত মানুষ ভালো হলেও খোকা ভালো হয় না , রোগাক্রান্ত খোকাকে বাঁচাতে পারে না দেবী আরোপিত দয়াময়ী। তখন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস মুহূর্তেই উড়ে যায় মন থেকে। তাকে সব শেষে দেখি খোকার শোকে, বিশ্বাসের পতনে ও দেবিত্ব ঘোচাতে আত্মহত্যা করতে। গল্পটির শুরু যেমন , শেষ হয়েছে সেভাবেই; কিন্তু রেশটুকু যেন বহুদূর ছড়ানো।

প্রভাতকুমার গদ্যকারের চোখে দেখেছেন পৃথিবীকে, সচেতনভাবেই লক্ষ করেছেন মানুষের সামান্য থেকে সামান্যাতি আচার-আচরণ, পরিবেশকে দেখেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে , পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গল্পগুলো পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য, 'আপনার' গল্প বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রভাতকুমারের গদ্যের বর্ণনায় পাঠকের অন্তর্চক্ষুতে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে গল্পের চরিত্রগুলো, স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিবেশ, উপাদানগুলো, দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয় পাঠকহৃদয়। তাঁর গল্পের সরস ও খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে বর্ণনায় পাঠকমাত্রই দৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে। এ ক্ষেত্রে 'কাশিবাসিনী' গল্পের শুরুতেই প্রভাতকুমারের স্কেচধর্মী বর্ণনার কথা বলা যেতে পারে- 'খগোলের বাজার হতে কিয়দ্দূরে , স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরিন্দ্রনাথের বাসাবাড়ি। মৃন্ময় গৃহখানি, খোলার চাল। রাস্তা হইতে সিঁড়ি উঠিয়া একটু বারান্দার মতো। তার পরই অন্তঃপুর। দুখানি শয়নঘর , একটি রসুই ঘর, একটি কাঠ রাখিবার ঘর (কপাট নাই); উঠানটি টালি বিছান; মধ্যস্থানে উচ্চ আলিসাযুক্ত কূপ; মাসিক ভাড়া ৩০ টাকা।' তীব্র পর্যবেক্ষণে কী নিপুণই না গদ্যের বর্ণনাশৈলী!

প্রভাতকুমারের গল্পের ঝোলাতে যেসব গল্প ছিল তার মধ্যে 'কুড়ানো মেয়ে' গল্পটি অন্যদের চেয়ে বেশ আলাদা ও একা। স্বল্প পরিসরের বন্ধন ভেঙে তাঁর এ গল্পটি হয়ে উঠেছে উপন্যাসের খসড়া। প্রভাতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এ গল্পেও 'পাঠক কৌতূহল' নিবৃত্ত করার দায়িত্ব অন্যান্যবারের মতো লেখক নিজেই নিয়েছেন। যদিও এ দায়িত্ব বাদে গল্পটি আরো সমৃদ্ধ, নিটোল ও বাহুল্যবর্জিত হতো। পরবর্তী সময়ে 'পাঠককে কৌতূহলী' রাখা স্টাইলে রূপ নিলেও প্রভাতকুমার হয়তো সচেতনভাবে তা আগ্রাহ্য করে চলেছিলেন। প্রভাতকুমার আন্তন চেকভ ও হেনরি জেমসের মতো 'ধীর স্বাভাবিক সমাপ্তি'র পক্ষপাতী ছিলেন এবং এ ধরনের সমাপ্তি তাঁর বেশ কিছু গল্পে ঘটেছে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে স্বাভাবিক সমাপ্তি টানলেও প্রভাতের গল্পগুলো যথেষ্ট রসপূর্ণ, নান্দনিক ও সুখপাঠ্য।

প্রভাতকুমার ৩০ বছর ধরে শতাধিক গল্পের মধ্যে ফুলের মূল্য , রসময়ীর রসিকতা, পোস্ট মাস্টার, নবকথা, গহনার বাক্স, যুবকের প্রেম, আদরিণী, মাতৃহীন উল্লেখযোগ্য। ছোটগল্পের পথচলার প্রথম পর্যায়ে প্রভাতের গল্পগুলো রচিত হলেও , কয়েক দশক পেরিয়ে এ যুগের পাঠকদের দাবি মেটাতে তাঁর গল্পগুলো সক্ষম। সমাজবাস্তবতায় , চিন্তনে, বিশ্বাসে, সংস্কারে, প্রেমে, মাহাত্ম্যে জীবনবোধে প্রভাতের গল্পগুলোর বেশির ভাগ চরিত্র আজও জনজীবনে প্রোথিত, মিশ্রিত। শুরুর দিকে হয়েও তিনি এখনো যথেষ্ট আধুনিক, পাঠকপ্রিয় ও স্বমহিমায় ভাস্বর।

**সংক্ষেপে লেখক পরিচিতি:**

বাংলা সাহিত্যে দু'জন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় নিজ নিজ প্রতিতভাবলে বিখ্যাত হয়েছেন। তাদের দু'জনের মধ্যে যিনি বয়সে বড়ো তিনি কথা সাহিত্যিক এবং কনিষ্ঠজনের খ্যাতি রবীন্দ্র জীবনীকার হিসেবে। কথা সাহিত্যিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি বর্ধমান জেলার ধাত্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটনা কলেজ থেকে স্নাতক হন। এরপর ১৯০১ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান এবং সেখান থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ১৯০৩ সালে দেশে ফেরেন। তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। 'রাধামণি দেবী' ছদ্মনামে লিখে তিনি 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছেন। দীর্ঘদিন 'মানসী' ও 'মর্মবাণী পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। তিনি মোট ১৪টি উপন্যাস ও শতাধিক গল্প লিখেছেন। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল – 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'সতীর পতি'। কয়েকটি বই চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। 'রসময়ীর রসিতকতা', 'বাস্তুসাপ', 'বলবান জামাতা', 'মাস্টার মশাই' প্রভৃতি মধুর হাস্যরস ও সাবলীলতার জন্য বাংলা সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

**নামকরণ :**

সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নামকরণ। নামকরণের উপর একটি কবিতা বা গল্পের সর্বাংশ নির্ভর করে। নামকরণের মাধ্যমে সাহিত্যকর্মের নিহিতার্থ পরিস্ফুট হয়। সাধারণত চরিত্র বা বিষয়ের উপর নির্ভর করে গল্পের নামকরণ করা হয়। আলোচ্য গল্পটিতে মোক্তার জয়রামবাবুর একটি আদরের মাদা হাতি ছিল। তার নাম আদরিণী। জয়রামবাবু একপ্রকার জেদের বশেই এই মাদি হাতিটি কিনেছিলেন। এই 'আদরিণী' নামের হাতিটি জয়রামবাবুর বাড়ির সকলের কাছে অত্যন্ত আদরের ছিল। আর্থিক অনটনের মধ্যেও জয়রামবাবু হাতিটিকে বিক্রি করতে রাজি হননি। কারণ তিনি আদরিণীকে তার নিজ নাতি নাতনির মতোই ভালোবাসতেন। একসময় নাতনির বিয়ের গয়না বানানোর জন্য টাকার যোগাড় করতে আদরিণীকে বিক্রি করতে বাধ্য হন। কিন্তু এতে তার মনে দুঃখের সঞ্চার হয়েছিল। আদরিণীর অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আদরিণী মারা যাওয়ার পর তিনি তার মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বার বার বলেছিলেন, "অভিমান করে তুই চলে গেলি মা? তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়েছিলাম বলে তুই অভিমান করে চলে গেলি?" ঠিক দু'মাস পরেই জয়বাম বাবুও মারা যান। আদরিণীকে কেন্দ্র করেই গল্পের বিষয়বস্তুর বিস্তার হয়েছে। তাই এই গল্পের নামকরণ 'আদরিণী' যথার্থ সার্থক হয়েছে।

**সারাংশঃ**

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়র উখিল কুঞ্জবিহারীবাবু এবং খ্যাতনামা মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায় এরা সবাই পীরগন্জের জমিদার মেজোবাবুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। ঘোড়ার গাড়ির উপায় নেই। আর গরুর গাড়িতে করে যেতে কমপক্ষে দু'দিন এবং আসতে দু'দিন লাগে। ডাক্তার ও জুনিয়র উকিল বাবু দুজনের অনাবোধে জয়রাম মোক্তার বিয়ের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য চৌধুরী বাবুদের কাছে একটি হাতি চেয়ে পত্র পাঠান। চৌধুরীবাবুর জানান বিয়ে বাড়িতে আসার জন্য হাতি পাঠানো যাবে না। এতে জয়রামপুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে । জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স পন্চাশ(50) পেরিয়েছে। মানুষটি লম্বা ছাদের, গায়ের রং আরেকটু পরিষ্কার হলে গৌরবর্ণ বলা যেত। কাঁচাপাকা মিশ্রিত মোটা মোটা মাথার সামনে টাক আছে। চোখ দুটো বড় বড় আর ভাসা ভাসা। তার হৃদয়ের কোমলতা যেন তার দুচোখ দিয়ে উঠলে পড়ছে। তার আদি নিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মুক্তারি করতে আসেন তখন তার সহায় সম্পত্তি বলতে কিছুই ছিল না। তিনি মুক্তারি করে প্রচুর টাকা উপার্জন করেছেন। পাকা দালান কোঠা ও বাগান

কিনেছেন। এছাড়া অনেকগুলি কোম্পানির কাগজেও কিনেছেন। জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের হৃদয় অত্যন্ত নরম ও স্নেহ স্নেহপ্রবণ হলেও মেজাজটা একটু রুক্ষ প্রকৃতির। যৌবনে তিনি রীতিমতো বদরাগী ছিলেন। তিনি যেমন অনেক অর্থ উপার্জন করতেন তেমনি তার ব্যয় এর পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। তিনি অকাতরে অন্ন দান করতেন। উৎপীড়িত গরিব লোকের বিনা পারিশ্রমিকে লড়তেন। এমনকি কখনো কখনো নিজের অর্থ ব্যয় করে তাদের মামলা চালাতেন। বন্ধু বান্ধব সকলকে নিয়ে তিনি থাকতে ভালবাসতেন। জয় রাম বাবুর বৈঠকখানায় সকলে মিলে তাস পাশা খেলত চৌধুরী বাবুদের কাছ থেকে হাতিয়ে আসবে এই আশা নিয়ে তিনি বাগানের কিছুটা অংশ পরিস্কার করিয়ে হাতির রাতে খাবারের জন্য বড় বড় পাতাযুক্ত কলাগাছ ও অন্যান্য গাছের ডালপালা ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময় একজন চাকর চৌধুরী বাবুদের ওখান থেকে ফিরে এসে জানালো যে তারা জানিয়েছে বিয়ের নিমন্ত্রণ হয়েছে , তার জন্য হাতি কেন ? গরুর গাড়িতে আসতে বল। একথা শুনে জয়রাম বাবু খুব লজ্জায় রাগে ক্ষিপ্ত প্রাপ্ত হয়ে উঠলেন। চৌধুরী বাবুদের এরূপ ব্যবহারে তিনি অপমানিত বোধ করলেন। জেদ করে বসলেন হাতি ছাড়া তিনি কোনোভাবেই বিয়ে বাড়িতে যাবেন না। তাই সে রাত্রে খবর নিয়ে পরের দিন সকালে উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে 2000 টাকার বিনিময়ে একটি মালিহাতি কিনে নিলেন। বাড়িতে হাতি নিয়ে আসা মাত্র গ্রামের সবাই এসে ভিড় জমাল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এর বড় বউ মা হাতির কপালে সিঁদুর লাগিয়ে হাতিটিকে বরণ করে নেন। হাতির নাম রাখা হয় আদরিনী। পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পরদিন বিকেলে মহারাজের কাছে হাতির পিঠে চড়ে দেখা করতে যান। মহারাজ কার হাতি জানতে চাইলে জয় রাম বাবু তাকে হুজুর বাহাদুরের হাতি বলে কিছুটা অপমানিত করার চেষ্টা করেন। পরে সমস্ত ঘটনা বন্ধু-বান্ধবদের বিস্তারিতভাবে বলেন। এ ঘটনার পর দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিবাহিত হয় মুক্তার জয়রামবাবুর অবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুন নিয়মে পাস করা শিক্ষিত মুক্তার জেলা কোর্ট ভরে গেছে। পুরনো আইন ব্যবসায়ীদের কেউ আদর করে না। ধীরে ধীরে মুখোপাধ্যায়ের আয় কমতে আরম্ভ করল। অপরদিকে তার সংসারের ব্যয় বেড়েই চলেছে। মুক্তার মহাশয় এর তিন ছেলে। প্রথম দুটি কোনো কাজ করে না , কেবল আনন্দ ফুর্তি করে দিন কাটায় । ইংরেজি না জানার জন্য জয়রাম মুক্তারের এজলাসে যেতে ইচ্ছে করে না। কারণ অনেক ছোট উকিলেরাও ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলে, যা জয় রাম বাবুর বোধগম্য হয় না।

এ সময় একদিন দায়ের আরেকটি খুদের আসে । ওই আসামি জয়রাম মুক্তার কে নিজ মুক্তার হিসেবে নিযুক্ত করল । একজন নতুন ইংরেজ জজ সাহেবের এজলাসে বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। তিন মাস ধরে মোকদ্দমা চলে। অবশেষে জয়রাম মুক্তার জজ সাহেবের সম্মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন । বক্তৃতা শেষে জয়রাম মুক্তারের মক্কেলকে নির্দিষ্ট করেন এবং তাদের অভিমত শিকার করে আসামিকে খুনের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেন । জয়রামবাবুর আইন সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান থাকার জন্য তার খুব প্রশংসা করেন। এরপর থেকে তিনি আর কখনো কাচারি যাননি। আইন ব্যবসা ছেড়ে দেবার পর জয় রাম বাবুর সংসার কোন রকম চলছিল। সুদের টাকার টাকায় সংসার চলছিল না। ফলস্বরূপ মূলধনে হাত পড়ল। ধীরে ধীরে কোম্পানির কাগজের সংখ্যাও কমতে শুরু হল। এমতাবস্থায় তার বন্ধুবান্ধবরা আদরিনী কে বেচে মাসে 30-40 টাকা খরচ কমানোর কথা বলেছিল। এতে মুক্তার মহাশয় বেজায় চটে ছিলেন। পরে তিনি নিজেই একটি উপায় বের করেছিলেন। তিনি হাতিটি ভাড়া দেওয়ার কথা ভেবে বিজ্ঞাপন দেন । কিন্তু এতে তিনি সফলতা পাননি । অবশেষে সবার পরামর্শে হাতিটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন । কারণ বড় নাতিনি কল্যাণীর বিয়ের বয়স হয়েছে । কিন্তু বিয়ে দেওয়ার মতো তার আর্থিক সামর্থ্য নেই । এ ব্যাপারে মেয়ের বাপের কোন ভাবনা চিন্তা নেই । যত দায় এই 60 বছরের বৃদ্ধ জয়রামের ঘাড়েই ছিল। অবশেষে একদিন কল্যাণীর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়। আদরিনী কে বিক্রি করে ওই টাকার বিয়ের গয়না বানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সেই উদ্দেশ্যে আদরিনী কে চৈত্রসংক্রান্তির বামনহাট মেলায় পাঠানো হয় । কিন্তু সেখানে উপযুক্ত দাম দেওয়ার গ্রাহকের অভাবে আদরিনী বিক্রি না হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। আদরিনী কে ফিরতে দেখে বাড়িতে আনন্দের কোলাহলে শুরু হয়ে যায় । কিন্তু কল্যাণীর বিয়ের কথা মাথায় রেখে জয়রাম মুক্তার পুনরায় বন্ধুদের পরামর্শে রসুলগঞ্জ সপ্তাহব্যাপী অন্য আরেক মেলায় আদরিনী কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন । পূর্বের দিন বিকালে জয়রাম মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রসূলগণের মেলায় পাঠানোর তিনি দুঃখে উপস্থিত থাকলেন না। কিন্তু কল্যাণী যখন এসে তাকে জানায় আদরিনী যাবার সময় কাদছিল , তখন তিনি আরো বেশি দুঃখ পান । মেঝেতে বসে দীর্ঘ শ্বাস ফেলতে থাকে আর বলতে থাকেন "জানতে পেরেছে ওরা অন্তর্যামী কিনা , ও বাড়িতে যে আর ফিরে আসবে না তা জানতে পেরেছে"।

বৃদ্ধ জয়রামের সবচেয়ে বড় দুঃখ আদরিনী যাবার সময় তার সঙ্গে দেখা না করা । তবু মনকে সান্ত্বনা দিতে বলেছিলেন "খুকির বিয়েটা হয়ে যাক তারপর তুই যার ঘরে যাবে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি তোকে সন্দেশ দিয়ে আসবো রসগোল্লা

নিয়ে যাব, যতদিন বেঁচে থাকবো তোকে কি ভুলতে পারবো , মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব , তুই মনে কোন অভিমান করিস নে মা"।

পরদিন বিকেলে খবর এলো আদরিনী পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই সংবাদ বৃদ্ধ জয়রাম আরো বিচলিত হয়ে পড়লেন। বাড়ির উঠোনে পাগলের মত পায়চারি করতে থাকেন এবং বলতে থাকেন "আদরের অসুখ যন্ত্রণায় সে ছটপট করছে আমাকে দেখতে না পেলে সে সুস্থ হবে না , আমি আর দেরি করতে পারব না "। রাত্রি দশটার সময় ছাড়লো পরদিন সকালে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে বৃদ্ধ দেখলেন সব শেষ হয়ে গেছে । আদরিনীর বিশাল দেহ খানি আম বাগানের ভেতর পড়ে আছে। তা নিশ্চল নিস্পন্দ । বৃদ্ধ ছুটে গিয়ে আদরিনীর মৃতদেহের কাছে লুটিয়ে পড়েন । তার বুকের নিকট মুখ রেখে কাঁদতে কাঁদতে বারবার বলতে থাকেন - "অভিমান করে চলে গেলি মা , তোকে বিক্রি করতে পাঠিয়ে ছিলাম বলে তুই অভিমান করে চলে গেলি"।

এ ঘটনার পর মাত্র দু'মাস মুখোপাধ্যায় মশাই জীবিত ছিলেন।

**শব্দার্থ :**

পগগ - পাগড়ি। তদারক - দেখভাল , দেখাশোনা। প্রবৃত্ত - রত। পদব্রজে - পায়ে হেঁটে। বদরাগী - বদ মেজাজি , অল্পতেই যার রাগ হয়। বচসা - ঝগড়া। ফিস - মাশুল। স্ফীত - ফুলে ওঠা। তত্তৎ - সেই সেই। বিপত্নীক - যার পত্নী গত হয়েছে। ধামা - বাঁশ-বেত দিয়ে তৈরি সরঞ্জাম। আলোচাল - আতপচাল। কদলীকা - কলাগাছের শাখা, ডাল। প্রাঙ্গণ - উঠোন। রাজসমীপে - রাজার নিকটে । কদর - সমাদর , চাহিদা। শামলা - আদালতের পোশাক বিশেষ। তরজমা - অনুবাদ, ভাষান্তর। কায়ক্লেশে - শরীরকে কষ্ট দিয়ে। সঙ্কুলান - পোষানো । কিঞ্চিৎ - সামান্য। অর্থাগম - আয়, রোজগার। পথিপার্শ্বস্থ - পথের পাশে অবস্থিত। আঁটিয়া - গেঁথে দেওয়া, টাঙিয়ে দেওয়া। খাই - লোভ, আকাঙক্ষা। নির্লিপ্ত - লিপ্ত নয় যে, উদাসীন। ফুলুট - ইংরেজি Flute, অথাৎ বাশি। খদ্দের - খরিদ্দার, ক্রেতা। প্রত্যুষে - প্রাতঃকালে, উষা লগ্নে, সকালবেলার আগেকার সময়। গাত্রোত্থান - গা তোলা, শয্যাত্যাগ। উদ্বেল - যা বেলাভূমি অতিম করে, ব্যাকুল। অপনীত - দূরীভূত। যথাবিদ্যা - যতথানি জ্ঞান আছে, বিদ্যানুসারে। প্রোথিত - পুঁতে দেওয়া। অবিলম্বে - বিলম্ব না করে। নবজলধরবর্ণ - নব মানে নতুন , জলধর অর্থ মেঘ, বর্ণ মানে রং; অর্থাত নতুন মেঘের রং। পতিত - পড়ে যাওয়া, পতন। নিশ্চল - অচল, চলতে পারে না। নিস্পন্দ - স্পন্দনহীন, নড়চড় নেই।

## অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

**Q.1** নগেন বাবুর পেশা কী?

**ANS:-** ডাক্তারি।

**Q.2** জয়রামের পেশা কী?

**ANS:-** মোক্তারি।

**Q.3** কুঞ্জবিহারী বাবু পেশায় ছিলেন?

**ANS:-** উকিল।

**Q.4** মেঝ বাবু কে?

**ANS:-** জমিদার নরেশ রায় চৌধুরী।

**Q.5** জয়রামের বয়স কত?

**ANS:-** পঞ্চাশের উর্ধে।

**Q.6** জয়রাম কার কাছে হাতি চেয়ে পাঠালেন?

**ANS:-** মহারাজ নরেশচন্দ্র চৌধুরি রায়বাহাদুরের কাছে।

**Q.7** জয়রামের আদি নিবাস কোথায় ছিল?

**ANS:-** যশোর জেলায়।

**Q.8** জয়রামের গাভীটির কী নাম ছিল?

**ANS:-** মঙ্গলা।

**Q.9** কার নামে জয়রাম তার গরুর বাছুরের নাম রেখেছিলেন?

**ANS:-** এজলাসের এক ডেপুটি বাবুর নামে।

**Q.10** উমাচরণ লাহিড়ীর বাসস্থান কোথায়?

**ANS:-** বীরপুরে।

**Q.11** চৈত্র সংক্রান্তির মেলা কোথায় হয়?

**ANS:-** বামনহাটে।

**Q.12** আদরিণী কে?

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের হাতির নাম আদরিণী।

**Q.13** হাতি তোর ____ পায়ে ____ । (শূন্যস্থান পূরণ করাে)

**ANS:-** হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি।

**Q.14** জয়রামের কয় ছেলে?

**ANS:-** তিন ছেলে।

**Q.15** "হাতি তোর গোদা পায়ে নাতি" এখানে 'নাতি' শব্দের অর্থ কী?

**ANS:-** লাথি।

**Q.16** 'আদরিণী' গল্পে উল্লেখিত মেলা দুটির নাম লেখো।

**ANS:-** বামনহাটের মেলা ও রসগঞ্জের মেলা।

**Q.17** "আদরিণী" গল্পটি কার লেখা?

**ANS:-** সাহিত্যিক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়।

**Q.18** পীরগঞ্জের চৌধুরিদেব বাধ মোক্তার কে?

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায়।

**Q.19** কে হাতির ললাটে তেল ও সিন্দুর দিল?

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বড় পুত্রবধু।

**Q.20** আদরিণী হাতিটির পিছনে মাসে কত টাকা খরচ হত?

**ANS:-** ত্রিশ-চলিশ টাকা।

**Q.21** আদরিণীকে কোন হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

**ANS:-** আদরিণীকে বামনহাটে বিত্রি করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

**Q.1** জয়রাম হাতি চেয়ে পাঠালেন কেন?

**ANS:-** পীরগঞ্জের জমিদার নরেশ রায় চৌধরি তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে নগেন ডাক্তার, জুনিয়ার উকিল কুঞ্জবাবু এবং জয়রাম মোখোপাধ্যায়কে নেমন্তন পাঠান। ডাক্তার নগেনবাবু ও জুনিয়র উকিলবাবুর অনুরোধে জয়রাম মোক্তার চৌধুরি রায় বাহাদুরের কাছে পত্র মারফত হাতি চেয়ে পাঠান বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য। অবশ্য চৌধুরীরা হাতি পাঠাননি।

**Q.2** কার নামে এবং কেন জয়রাম তার বাছুরের নাম রেখেছেন?

**ANS:-** এক ডেপুটির নামে জয়রাম তার বাছুরের নাম রেখেছেন। একদিন এজলাসে এক ডেপুটির সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। সেদিনই বিকেলে বাড়ি এসে দেখে, তার মঙ্গলা গাভি একটি এড়ে বাছুর প্রসব করেছে। তখন আদর করে উক্ত ডেপুটি বাবুর নামে বাছুরটির নামকরণ করেন।

**Q.3** জয়রামের বর্তমান নিবাস কোথায়?

**ANS:-** জয়রামের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের যশোর জেলায়। কিন্তু তার বর্তমান নিবাস এপার বাংলায়।

**Q.4** কী কারণে আদালতে জয়রাম মোক্তারের জরিমানা হয়েছিল?

**ANS:-** একবার এক ডেপটির সামনে জয়রাম মোক্তার আইনের তর্ক করছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই তার কথায়, সায় দিচ্ছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জরম মোক্তার বলে বসলেন - আমার স্ত্রীর যতটুক , আইন-জ্ঞান আছে, হুজুরের তাও নাই দেখছি সেদিন, আদালত অবমাননার জন্য জয়রাম মোক্তারের পাঁচ টাকা জরিমানা হয়েছিল।

**Q.5** জয়রাম কোথা থেকে হাতি ক্রয় করলেন এবং কেন?

**ANS:-** জয়রাম বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে একটা বাচ্চা হাতি ক্রয় করলেন । পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়র উকিল কুঞ্জবিহারী বাবুর অনোরোধে জয়রাম মোক্তার বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য পত্র মারফত চৌধুরি বাবুদের কাছে একটি হাতি ছেয়ে বসেন। চোধরিরা বা তার অনোরোধ প্রত্যাখান করেন। এতে তার মতো খ্যাতনামা মোক্তারের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। তাই তিনি হাতি ক্রয় করে ফেলেন।

**Q.6** কে, কার কাছে হাতি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন?

**ANS:-** জয়রাম মোক্তার চৌধুরি রায় বাহাদুরের কাছে তার মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে পত্র মারফত হাতি চেয়ে পাঠান।

**Q.7** "আপনি জ্ঞানী লোক, মায়া পরিত্যাগ করোন।" উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে?

**ANS:-** উক্তিটি জয়রামবাবুর বন্ধুদের। জয়রাম বাবু বড়ো নাতিনি কল্যাণীর এক জায়গায় বিয়ে স্থির হয়েছে , আর আড়াই হাজার টাকা হলেই এই বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু জয়রামবাবুর আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এরমধ্যে খবর আসে তার কনিষ্ঠ পুত্র বিএ পরীক্ষায় ফেল করেছে। সে সময় তার বন্ধুরা হাতিটিকে বিক্রি করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে

**Q.8** আদরিণী কে? আদরিণীকে নিয়ে জয়রাম কীরূপ সমস্যায় পড়েছিলেন?

**ANS:-** আদরিণী জয়রাম মোক্তারের পালিত মাদি হাতির নাম। জয়রাম মোক্তারের আর্থিক অবস্থা দিন দিন মন্দের দিকে যাচ্ছিল। দিন দিন ব্যয় বেড়েই যাচ্ছিল। এদিকে হাতিটির খরচের জন্য মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকার প্রয়োজন হত। এই খরচ জোগানো তার কাছে একটি বড়ো রূপে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

**Q.9** কল্যাণী কে? কত তারিখে বিয়ে ঠিক হয়েছিল?

**ANS:-** কল্যাণী হল জয়রাম মোক্তারের বড়ো নাতনি। ১০ই জ্যৈষ্ঠ তার বিয়ে স্থির হয়েছিল।

**Q.10** 'তাই ত! সব মাটি?' কে কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন?

**ANS:-** সন্ধ্যার একটু আগে জয়রামবাবু বৈঠকখানায় বসে পাশাখেলা দেখছিলেন। সে সময় পত্রবাহক ভৃত্য ফিরে এসে জানাল যে চৌধুরি বাড়ি থেকে হাতি পাওয়া যায়নি। তাই বিয়ে বাড়িতে যাওয়া অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গেই নগেন্দ্র বাবু উদ্ধৃত উক্তিটির অবতারণা করেছিলেন।

**Q.11** পত্রবাহক ভৃত্য হাতি সম্পর্কে কী খবর এনেছিল?

**ANS:-** জয়রাম মোক্তার চৌধুরি বাহাদুরের কাছে পত্র মারফত বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য একটি হাতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পত্রবাহক ভৃত্য ফিরে এসে জানায় যে, হাতি পাওয়া যায়নি। জয়রাম মোক্তার বিশদভাবে জানতে চাইলে ভৃত্য বলে, দেওয়ানজীকে চিঠি দিয়েছিল। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খবর জানান যে, 'বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতি কেন? গোরুর গাড়িতে আসতে বোলো।'

## সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

**Q.1** জয়রাম মুখোপাধ্যায় কে? তার স্বভাবের পরিচয় দাও।

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায় একজন নামকরা মোক্তার। তার হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ। তবে তার মেজাজ কিছুটা রুক্ষ প্রকৃতির। যৌবনে তিনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন। সেকালে হাকিমেরা একটু অবিচার অত্যাচার করলেই তিনি রেগে চেঁচিয়ে অনর্থপাত করে তুলতেন। তিনি যেমন অর্থোপার্জন করতেন , তেমনি অকাতরে অনুদানও করতেন। অত্যাচারিত, উৎপাদিত গরীব লোকের মোকদম বিনা মাশুলে, এমনকী নিজ খরচে বহন করা পর্যন্ত চালিয়ে দিতেন।

**Q.2** জয়রামের প্রথম দিকের জীবনযাপন কেমন ছিল?

**ANS:-** জয়রামের আদি নিবাস যশোর জেলায়। এখানে যখন প্রথম মোক্তারি করতে আসেন তখন তিনি অত্যন্ত গরীব ছিলেন। সহায় সম্পত্তি বলতে কিছুই তার ছিল না। কেবল মাত্র এক ক্যাম্বিসের বেগ আর একটি পিতলের ছটি সম্বল করে এপার বাংলায় আসেন। মাসিক তেরো সিকিতে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে নিজের হাতে রেঁধে খেয়ে মোক্তারি ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন।

**Q.3** 'পরের জিনিষ, জোর ত নেই।' উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে তিনি এই উক্তিটি করেছেন?

**ANS:-** জয়বামের জনৈক বন্ধু এই উক্তি করেছেন।

জয়রাম বাবু বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য ভৃত্য মারফত পত্রযোগে মহারাজ নরেশচন্দ্র রায়চৌধুরির কাছে হাতি চেয়ে পাঠান। চৌধুরি বাবু সেই ভৃত্য মারফত জানান যে, বিয়ে বাড়িতে আসার জন্য হাতি পাঠানো যাবে না। এতে জয়রাম বাগে ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হয়ে ওঠেন। তার হাত-পা ঠক ঠক করে কাপতে থাকে। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরা ফুলে উঠতে থাকে। জমায়েত হওয়া ভদ্রলোকেরা খেলা রন্ধ করে হাত গুটিয়ে নেন। সে সময়ই জয়রাম বাবুর জনৈক বন্ধু উদ্ধৃত উক্তিটি করেন।

**Q.4** আদরিণী কে? তার আগমনে গ্রামে কী অবস্থা হয়েছিল বর্ণনা করো।

**ANS:-** আদরিণী জয়রাম বাবুর একটি মাদি হাতির নাম।

আদরিণী নামের মাদি হাতিটি জয়রামবাবুর বাড়িতে আসা মাত্র পাড়ার সকল ছেলেরা বৈঠকখানার উঠোনে এসে ভিড় করে দাড়ায়। দু-একটি ছেলে সুর করে বলতে থাকে – 'হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি'। এতে বাড়ির লোকেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অপমান করে তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

**Q.5** জয়রামের বাড়িতে আদরিণীকে কীরূপ আপ্যায়ন করা হয়েছিল?

**ANS:-** আদরিণী গিয়ে অন্তঃপুরে দরজার কাছে দাড়ায়। জয়রামবাবু বিপত্নীক ছিলেন। তাই তর বড়ো বউমা একটা ঘটিতে জল নিয়ে বাইরে এলেন। সেই জল ভয়ে ভয়ে কোনরকম হাতিটির চারটি পায়ে একটু একটু করে ঢেলে দেন। মাহুতের ইশারায় হাতি জানু পেতে বসলে বড়ো বউমা তেল ও সিদুর তার কপালে লেপে রাঙিয়ে দেন। ঘন ঘন শাঁখ বাজতে থাকে। তারপর আদরিণী উঠে দাড়ালে একটা ধামায় আতপচাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য তার সামনে রাখা হয়। আদরিণী কিছুটা শুড় দিয়ে তোলে তোলে খায়। বেশির ভাগই চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

**Q.6** 'যেনো হারানো ধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে' উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বড়ো নাতনি কল্যাণীর ১০ই জ্যৈষ্ঠ বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তার 'আদরিণী' নামের পোষা মাদি হাতিকে বামুন হাটের মেলায় বিক্রি করার জন্য আনা হয়েছে। হাতি বিক্রি করে টাকা হাতে এলে জয়রাম বাবু বিয়ের গহনা গড়তে দেবেন।

কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যার সময় আদরিণী বিক্রি না হয়ে ঘরে ফিরে এলো। উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার মতো ক্রেতা জোটেনি। এদিকে আদরিণীকে ফিরে আসা দেখে বাড়ীতে কোলাহল পড়ে যায়। সে সময় আদরিণী বিক্রি হয়নি বলে কারোও মনে খেদের চিহ্ন দেখা যায়নি। বরং মনে হয়েছ যেনো হারানো ধন ফিরে পাওয়া গিয়েছে । সকলের আচরণে এরুপ মনে হতে লাগল।

**Q.7** "যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে। ষাট বৎসরের বুড়াটি কে? তিনি কীভাবে দায়ে পড়েছিলেন?

**ANS:-** ষাট বৎসরের বুড়োটি হলেন জয়রাম মুখোপাধ্যায়।

তিন ছেলে, নাতি নাতনি নিয়ে জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বিরাট পরিবার। ছোট নাতনি কল্যাণী বারো বছরে পা দিয়েছে। দেখতে দেখতে যেরূপ বড়ো হয়ে উঠছে , যে তার বিয়ে তাড়াতাড়ি না দিলেই নয়। নানা জায়গা থেকে তার সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু ঘর, বর মনের মতন হয় না। যদি বা ঘর বর মনের মতো হয় , তবে বরপক্ষ প্রচুর পণ দাবি করে বসে। মেয়ের বাপ এ বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত। সে নেশাভাঙ করে , তাস পাশা খেলে, বাঁশি বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাই যত দায় এই ষাট বছরের বুড়ো জয়রান মুখোপাধ্যায়ের ঘাড়ে পড়ে।

**Q.8** 'জানতে পেরেছে, ওরা অন্তর্যামী কিনা।' উক্তিটি কার? ওরা বলাতে এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে? এখানে জানার ব্যাপারটা কী ব্যাখ্যা করো।

**ANS:-** উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের। 'ওরা' বলতে এখানে 'আদরিণী' নামের মাদি হাতি সহ সমস্ত মূক প্রাণীদের কথা বলা হয়েছে। প্রাণীরা ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, অনুভব করতে পারে। তারা অন্তর থেকে তা অনুভব করে। আদরিণী বুঝতে পেরেছিল তাকে জয়রামবাবুর বাড়ি থেকে চিরদিনের মতো বিদায় জানাতে সবাই হাজির হয়েছে। তাই বিদায়বেলায় তার এত সেবা যত্ন। সে বুঝতে পেরেছে যে সে আর জয়রাম বাবুর বাড়িতে ফিরে আসবে না।

**Q.9** 'যাবার ত খুবই ইচ্ছে' - কার কোথায় যাবার ইচ্ছে এবং কেন?

**ANS:-** নগেন্দ্র ডাক্তারের পীরগঞ্জের মেজবাবুর মেয়ের বিয়েতে যাবার খুবই ইচ্ছে। কারণ, লোকমুখে শুনেছেন খুব ধুমধাম করে মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে হবে। বেনারস থেকে বাই আসছে , কলকাতা থেকে খেমটা আসছে। তাই তার যাবার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে।

**Q.10** "আমার স্ত্রীর যতটুকু আইন জ্ঞান আছে হুজুরের তাও নাই দেখছি। " - এখানে আমার স্ত্রী বলতে কার স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে? হুজুরই বা কে? কেন তাকে একথা বলেছেন?

**ANS:-** এখানে আমার স্ত্রী বলতে জয়রাম মোক্তারের স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে। হুজুর হলেন হাকিম। এক ডেপটির সামনে জয়রাম মোক্তার আইনের তর্ক করছিলেন, কিন্তু হাকিম কিছুতেই তাঁর কথায় সায় দিচ্ছিলেন না। অবশেষে রাগের মাথায় জয়রাম উল্লেখিত উক্তিটি বলেছেন।

**Q.11** জয়রাম যে হাতি ভাড়ার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তার বয়ান নিজের ভাষায় লেখো।

**ANS:-** জয়রাম মোক্তারের তার পোষা মাদি হাতি ভাড়া দেওয়ার জন্য যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল তার বয়ান তিনি নিজেই লিখেছিলেন। বয়ানের বিষয়বস্তু ছিল এইযে - বিয়ের শোভাযাত্রা, দূর-দূরান্তে যাতায়াত প্রভৃতি করার জন্য আদরিণী নামে এক মাদি হাতি ভাড়া দেওয়া হবে ভাড়া দিনে মাত্র তিন টাকা হস্তিনীর খোরাকি এক টাকা , মাহুতের খোরাকি ।।০ একুনে ৪।।০ ধার্য করা হয়েছে । যাহার আবশ্যক হইবে নিম্নের ঠিকানায় তত্ব লইবেন । এই বয়ানের নিচে ছিল জয়রামবাবুর নাম এবং ঠিকানা।

**Q.12** এখন ব্যবসায়ের প্রতি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের আর অনুরাগ নেই কেন?

**ANS:-** এখন ব্যবসায়ের প্রতি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের আর সেই আগের মতো অনুরাগ নেই। ব্যবসার প্রতি বড়োই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। কারণ ছোকরা মোক্তারগণ যাদেরকে এক সময় উলঙ্গ অবস্থায় পথে খেলা করতে দেখেছেন , তারা এখন শামলা (আদাতের পোশাক বিশেষ) মাথায় দিয়ে তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়িয়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে ফর ফর করে ইংরেজিতে হাকিমকে কী বলতে থাকে , তিনি তার কিছুই বুঝতে পারেন না। পাশে থাকা ইংরেজি জানা জুনিয়রকে 'উনি কী বলেছেন?' জিজ্ঞাসা করলে জুনিয়র তার তর্জমা করে তাকে বোঝাতে বোঝাতে অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এতে মুখের জবাব তার মুখেই রয়ে যায়। নিস্ফল রোষে তিনি ফুলতে থাকেন। তাছাড়া আগে হাকিমগণ তাকে যেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, এখনকার নতুন হাকিমগণ আর তা করেন না।

## দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর

**Q.1** "..... ওদের একে একে বিক্র করে ফেল।" - উক্তিটি কার? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে? উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

**ANS:-** উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের। এ ব্যবসা ছেড়ে দেবার পর জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের তিন ছেলে , নাতি-নাতনি নিয়ে বিশাল সংসার কোন রকমে চলতে থাকে। সুদের টাকায় আর তার চলে না। ধীরে ধীরে তার মূলধনে হাত পড়তে লাগল। কোম্পানির কাগজের সংখ্যাও কমতে লাগল। এমতাবস্থায় বন্ধু-বান্ধবরা তাঁর 'আদরিণী' নামের হাতিটি বিক্রি করে খরচ কমাতে বলায় তিনি এই উক্তিটি করেছেন।

আসল কথা হল জয়রাম মুখোপাধ্যায় মশায় গত পাঁচ বছরে 'আদরিণী' নামের এই হাতিটিকে তাঁর নাতি নাতিনিদের মতোই ভালোবেসে ফেলেছেন। তাই খরচ কমানোর জন্য হাতিটিকে বিক্রি করে দিতে বলায় তিনি বলেছিলেন , "তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতি-নাতনিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় যাচ্ছে ওদের একে একে বিক্রী করে ফেল।"

**Q.2** "ওঁর মুখ দিয়ে ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে ... " ব্রহ্মবাক্য বলতে কী বোঝায় ? কার মুখ দিয়ে এই বাক্য নির্গত হয়েছে এবং বাক্যটি কী?

**ANS:-** নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য বলা হয়। এই ব্রহ্মবাক্য বেরিয়েছে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'আদরিণী' গল্পের প্রধান চরিত্র জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে। জয়রামের 'আদরিণী' নামের একটি মাদি হাতি ছিল যাকে জয়রাম ও তার পরিবার অতো ভালোবাসত। জয়রাম আদরিণীকে নিজ নাতি নাতনির মতো আদর কতেন। কিন্তু বয়স হওয়ার পর তার মুক্তারি ব্যবসা আর ভালো চলছিল না। এদিকে সংসারের ব্যয়ও বেড়েই চলছিল। তাই তার পক্ষে হাতি পোষাও কঠিন হয়ে পড়ে। আদরিনী কে পোষার জন্য জয়রামবাবুর মাসে ৩০-৪০ টাকা ব্যয় হয় । ব্যয়ভার লাঘব করার জন্য আদরিনী কে ভাড়াও দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তাতেও সুবিধে হয়নি । তাই অবশেষে বন্ধুদের পরামর্শে তাকে বামুনহাটের মেলায় বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আদরিণীকে মেলায় পাঠানোর সময় জয়রামবাবু বলেছিলেন, 'আদর, যাও মা, বামুনহাটের মেলা দেখে এস। ' উপযুক্ত মূল্য দেবার খরিদ্দার না পাওয়ায় আদরিণী বিক্রি হল না। কথায় বলে নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ রাহ্মণ কিছু বললে সেটা ফলবেই। তাই জয়রামের গ্রামেরই একজন প্রতিবেশী বলেছে, 'জয়রামের মতো সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখে এসো' কথাটি বলেছিলেন বলেই আদরিণী বিক্রি না হয়ে আবার বাড়ি ফিরে এসেছে।

**Q.3** আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায় সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। - বৃদ্ধটি কে ? তিনি কাকে বিদায় সম্ভাষণ করতে পারলেন না এবং কেন?

**ANS:-** বৃদ্ধটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়।।

তিনি 'আদরিণী' নামের তার মাদি হাতিটিকে বিদায় সম্ভাষণ করতে পারলেন না।

জয়রামবাবু পাঁচ বছর আগে আদরিণীকে কেনেন। এই প্রাণীটি তার বড়োই আদরের ছিল। তিনি তার নাতি-নাতনিদের মতো তাকে অত্যন্ত ভালো বাসতেন। কি বড়ো নাতনি কল্যাণীর বিয়েতে অর্থ সংগ্রহ করতে না পারায় একপ্রকার বাধ্য হয়ে বন্ধুদের পরামর্শে আদরিণীকে বিক্রি করতে বামুনহাটের মেলায় পাঠান। সেখানে উপযুক্ত দাম দেওয়ার মতো খদ্দের না মেলায় আদরিণী বাড়িতে ফিরে আসে। বামুনহাটের মেলার পর, সেখান থেকে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে এক সপ্তাহ ধরে আর এক মেলা হয়। যে সকল গরু-মহিষাদি বামুনহাটে বিক্রি হয় না সে সব গিয়ে রসূলগঞ্জে জমা হয়। সেখানেই আদরিণীকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হল। তাই আবার আদরিণী মেলায় যাবে। এবার আর মুখোপাধ্যায় মশায় তার কাছে গিয়ে বিদায় সম্ভাষণ করতে পারলেন না। কারণ আদরিণীকে বিদায় সম্ভাষণ করতে তার হৃদয় ভেঙ্গে পড়ছে। তাই বিদায়ের শেষ মুহুর্তে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আদরিণীকে বিদায় সম্ভাষণ করতে পারলেন না।

**Q.4** 'দাদামশায় আদর যাবার সময় কাদছিল।'- উক্তিটি কার? 'আদর' কে? সে কোথায় যাচ্ছিল? আদর যাবার সময় কাদছিল কেন?

**ANS:-** উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বড়ো নাতনি কল্যাণীর। 'আদর' হল জয়রামের 'অদিরিণী' নামের পোষা মাদি হাতি।

জয়রামবাবু আদরিণীকে রসুলগঞ্জের সপ্তাহব্যাপী মেলায় বিক্রির জন্য পাঠিয়েছিলেন । পশুরা তাদের দুঃখের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও চোখে মুখে তার ছায়া ফুটে উঠে । আদরিণীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। জয়রামবাবু যে তাকে মেলায় বিক্রি করতে পাঠাচ্ছে এবং সে যে আর কোনো দিন এই বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে না সেটা সেও (আদরিণী) বোঝতে পেরেছিল। তাই দুঃখে সে(আদরিণী) কাদছিল।

**Q.5** আদরিণীর বিদায় পর্বে জয়রাম কী বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন?

**ANS:-** আদরিণীকে জয়রাম সত্যিকারে ভালোবাসতেন। মেয়ের মতো তাকে আদর করতেন । তাই রসুলগঞ্জের মেলাতে তাকে বিক্রি করতে পাঠিয়ে দেওয়ার তার হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল। এরই মধ্যে বড়ো নাতিনি কল্যাণী এসে বললো "'আদর' যাবার সময় কাদছিল"। তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটিতে বসে পড়েন এবং বলতে থাকেন - "জানতে পেরেছে, ওরা অন্তর্যামী কিনা। ও বাড়িতে যে আর ফিরে আসবে না তা জানতে পেরেছে। যাবার সময় দেখা না করায় তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন। তাই কল্যাণীর চলে যাবার পর সজল নয়নে আপন-মনে বলতে থাকেন । যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখা করলাম না। সে কি তোকে অনাদর করে না । না তা নয় , তুই তো অন্তর্যামী । তুই কি আমার মনের কথা বুঝতে পারিসনি। খুকির বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর তুই যার ঘরে যাবি তাদের বাড়ি গিয়ে আমি তোকে দেখে আসবো । তোর জন্য সন্দেশ নিয়ে যাব, রসগোল্লা নিয়ে যাবো। যতদিন বেঁচে থাকবে তোকে কি ভুলতে পারবো। মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে

দেখে আসবো। তুই মনে কোন অভিমান করিস নে মা ।" আপন মনে এসকল কথা বলে জয়রাম মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন।

**Q.6** টীকা লেখো : খেমটা, বেনারস।

**ANS:-**

**খেমটা** : খেমটা এক ধরনের নাচ। এটা তালের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। গানও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এই নাচ গানের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম। এই নামের কোনো নির্দিষ্ট উপলক্ষ নেই। যে-কোনো সামাজিক বা লৌকিক অনুষ্ঠানে এই নাচ গানের আয়োজন হতে পারে। এক কালে বিয়ের আসরে এই নাচের বেশ প্রচলন ছিল। মূলত মেয়েরাই এই নাচের শিল্পী। কোনো কোনো অঞ্চলে বৃহন্নলা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও এই নাচ খেলে।

**বেনারস** : বেনারস হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। বহু হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এই তীর্থে বেড়াতে যান। বেনারসের পবিত্র ঘাটে স্নান করে মন্দিরে পূজা দেন।

## দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর

**Q.1** জয়রামের চরিত্র বর্ণনা করো।

**ANS:-** জয়রাম একজন নামকরা মোক্তার ছিলেন। তার হৃদয় অত্যন্ত নরম ও স্নেহপ্রবণ হলেও মেজাজটা ছিল কিছুটা রুক্ষ প্রকৃতির। যৌবনে তিনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন তবে এখন তিনি অনেকটাই ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। সে সময় হাকিমেরা একটু অবিচার করলেই তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতেন। তিনি মোক্তারি করে প্রচুর আয় যেমন করতেন তেমনি তার ব্যয়ও ছিল যথেষ্ট। তিনি অকাতরে অন্নদান করতেন। অত্যাচারিত , উৎপীড়িত গরীব লোকের মামলা-মোকদ্দমা বিনা মাশুলে লড়তেন। এমনকী কখনো নিজের অর্থ ব্যয় করে তাদের মোকদ্দমা চালাতেন। তিনি তার পোষা মাদি হাতিকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। এখানে তার স্নেহপ্রবণ দিকটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। "আদরিণী" নামক গল্পের এই চরিত্রটি গল্পের বিভিন্ন অংশে বিভিন্নভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাই জয়রাম চরিত্রটি পাঠকমনাকে সহজেই আকর্ষণ করে।

**Q.2** জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের জীবন সম্পর্কে যা জান লেখো।

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বাংলাদেশের যশোর জেলায়। তিনি বহুদিন আগে এখানে মোক্তারি করতে আসেন। তিনি প্রথম যখন এখানে আসেন সে সময় এদিকে রেল ছিল না। পদ্মা পার হয়ে কিছুটা পথ নৌকোয় করে , কিছুটা পথ গরুর গাড়ি করে এবং কিছুটা একটি পায়ে হেটে এখানে আসতে হয়েছিল। সম্পত্তি বলতে তার কিছুই ছিল না। মাসিক তেরো সিকায় একটি বাড়ী ভাড়া করে নিজের হাতে রান্না বান্না কর মোক্তারী শুরু করেন । এখন সেই জয়রাম মুখোপাধ্যায় পাকা দালানকোঠা করেছে, বাগান করছেন, পুকুর করছেন, অনেকগুলি কোম্পানির কাগজও কিনেছেন। ইংরেজি ইংরেজী জানা মোক্তারদের আগমন সত্ত্বেও এখনও তিনি এ জেলার প্রধান মোক্তার।

**Q.3** 'হাতী দিলে না। হাত দিলে না।' উক্তিটি কার? প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো।

**ANS:-** উক্তিটি জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের।

জয়রামবাবু চৌধুরি বাড়ির বাঘা মোক্তার। তিনি অনেক দিন ধরে চোধুরিদের কাজ করে আসছেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার মনে হয়েছিল জমিদার নরেশ চন্দ্র রায় চৌধুরির মেয়ের বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার জন্য হাতি চেয়ে পাঠালে অবশ্যই তিনি সে ব্যবস্থা করে দেবেন। তাই বন্ধুদের অনুরোধকল্পে তিনি চৌধুরি বাড়িতে ভৃত্য মারফত হাতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু জয়রামের ভৃত্য চৌধুরি বাড়ি থেকে ফিরে এসে জানায় , হাতি পাওয়া যায়নি। সে জয়রামকে জানায় যে , দেওয়ানজীকে চিঠি দেওয়ার পর তিনি সেই চিঠি মহারাজের কাছে নিয়ে যান। কিছু সময় পর দেওয়ানজী ফিরে এসে বলেন , 'বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে তার জন্যে হাতী কেন ? গোরুর গাড়িতে আসতে বোলো। ' একথা শুনে জয়রাম রাগে , ক্ষোভে, লজ্জায়, যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। তার হাত পা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। মুখমণ্ডলের শিরা উপশিরাগুলি স্ফীত হয়ে উঠে। এতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাই জয়রাম বাবু এই উক্তিটি করেছিলেন । আসলে চৌধুরি মশাই যে এভাবে তাকে অপদস্ত করতে পারেন, তা তিনি কখনো কল্পনাই করতে পারেননি।

**Q.4** 'এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না'। উক্তিটি কার? এখানে কার বিয়ের কথা বলা হয়েছে? বক্তা ওই বিয়েতে যেতে চান না কেন?

**ANS:-** উদ্ধৃত উক্তিটি মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের।

এখানে পীরগঞ্জের জমিদার মেজবাবুর মেয়ের বিয়ের কথা বলা হয়েছে।

পাড়ার নগেন ডাক্তার, জুনিয়র উকিল কুঞ্জবিহারী এবং নামকরা মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায় এরা সবাই ওই বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেয়েছে। কিন্তু তাদের এখানে যেতে এবং ফিরে আসতে দিন সময় লেগে যাবে। তাই ডাক্তার ও উকিলের অনরোধে জয়রাম মোক্তার বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য চৌধুরি বাবুদের কাছে একটি হাতি চেয়ে পাঠান। চৌধুরিরা জানান যে বিয়ে বাড়িতে আসার জন্য হাতি পাঠানো যাবে না। এতে জয়রাম চটে গিয়ে বিয়ে বাড়িতে নাযাওয়ার কথা বলেন।

তিনি তিনিও জেদ করে বলেন যে বিয়ে বাড়িতে গেলে হাতী চড়েই যাবেন , তা না হলে বিয়ে বাড়িতে যাবেনই না। ওর মনে হয়েছে, চৌধুরীবাবুরা তাকে হাতী না দিয়ে বন্ধু বান্ধবদের কাছে যথেষ্ট ছোট করেছেন।

**Q.5** মেজবাবুর মেয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য জয়রাম কি উপায় অবলম্বন করলেন এবং কেন?

**ANS:-** পীরগঞ্জের জমিদার মেজবাবুর মেয়ের বিয়েতে নগেন ডাক্তার, জুনিয়র উকিল কুঞ্জবিহারী এবং জয়রাম মোক্তার এরা প্রত্যেকেই নিমন্ত্রণ পান। কিন্তু পীরগঞ্জের জমিদার মেজবাবুর বাড়িতে যাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ ঘোড়ার গাড়ির পথ ছিল না এবং গরুর গাড়ি করে ওখানে যেতে দু 'দিন এবং আসতে দু'দিন সময় লাগত। তাই নগেন্দ্র ডাক্তার ও উকিল কুঞ্জবিহারীর অনুরোধে জয়রাম মোক্তার বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য চৌধুরি বাবুদের কাছে একটি হাতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু তারা গরুর গাড়িতে চড়ে আসতে বলেন। এতে জয়রাম মোক্তার বেজায় চটে যান। অবশ্য শেষে তিনি দু'হাজার টাকার বিনিময়ে একটি মাদি হাতি কিনে তাতে চড়েই বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিলেন।

**Q.6** জয়রাম কীভাবে সাংসারিক অচলাবস্থায় পড়লেন এবং কীভাবে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করলেন তা বর্ণনা করো।

**ANS:-** জয়রাম মুখোপাধ্যায় একজন নামকরা মোক্তার ছিলেন। আইন বিষয়ে তার প্রচুর জ্ঞান ছিল। অধিকাংশ মামলা-মোকদ্দমায় তিনি জিততেন। সেই সুবাদে প্রচুর অর্থও উপার্জন করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র ক্যাম্বিসের একটি ব্যাগ এবং পেতলের একটি ঘটিকে সম্বল করে যশোর জেলা থেকে এপার বাংলায় মোক্তারি করতে এসেছিলেন। এখন তার পাকার দালানকোঠা, বাগান, পুকর। এছাড়া কোম্পানির কাগজ কিনেছেন। তিনপুত্র, দুই পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি, চাকর-বাকর নিয়ে বিশাল পরিবার। এই পরিবার পরিচালনার জন্য জয়রাম মোক্তারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হত। কিন্তু বর্তমানে তার আয় অনেক কমেছে। এজলাসে ইংরেজি জানা অনেক উকিল , মোক্তার এসেছে। যার ফলস্বরূপ পুরনো মোক্তারদের আইন ব্যবসা লাটে উঠেছে। তাদের কদর আর এখন নেই। ফলে জয়রাম মোক্তারের আয় কমতে লাগল। ধীরে ধীরে মূলধনে তার হাত পড়ল। অপরদিকে সংসারের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেল। প্রথম দু 'ছেলে কোন কাজকর্ম না করে কেবল আনন্দ ফুর্তি করে দিন কাটায়। ছোটো ছেলেটি কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করে। এদিকে বড়ো নাতনি কল্যাণীর বিয়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু বিয়ে দেওয়ার মতো অর্থ জয়রাম মোক্তারের নেই। এ ভাবেই তিনি সাংসারিক অচলাবস্থায় পড়েছিলেন। এরূপ অবস্থায় বন্ধুরা আদরিণীকে বেচে দেওয়ার পরামর্শ দেন। প্রথমদিকে জয়রাম মোক্তার বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করেননি। কিন্তু পরে তিনি বন্ধদের পরামর্শে 'আদরিণী'কে বিক্রি করতে সম্মত হন। এভাবেই আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করেন।

**Q.7** "ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল"। - এখানে ব্রাহ্মণ কে? উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

**ANS:-** এখানে ব্রাহ্মণ বলতে মোক্তার জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে বোঝানো হয়েছে।

জয়রাম মোক্তারের বড়ো নাতনি কল্যাণীর বিয়ের অর্থ যোগাড় করতে তার 'আদরিণী' নামের মাদি হাতিটিকে বিক্রির জন্য বামুন হাটের মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপযুক্ত দাম দেওয়ার খরিদ্দার না জোটায় আদরিণী বাড়িতে ফিরে আসে। পরে বদ্ধদের পরামর্শে আদরিণীকে রসুলগঞ্জের সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলায় পাঠানো হয় । বামুনহাটের মেলায় যে সকল পশু বিক্রি হয় না সেগুলিকে আবার এই রসূলগঞ্জের মেলায় এনে জড়ো করা হয়। কিন্তু রসূলগঞ্জের মেলায় পাঠানোর সময় মনের দুঃখে জয়রামবাবু 'আদরিণী'র সঙ্গে দেখা করননি। তাই কল্যাণী যখন এসে জানাই যে আদরিনী যাবার সময় কাঁদছিল, তখন তার দুঃখ বহুগুণ বেড়ে যায় । পরদিন বিকেলে একটি চাষী লোক একখানি চিঠি এনে জয় রাম বাবুর হাতে দেয়। চিঠি পড়ে তার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। মধ্যম পুত্র লিখেছে বাড়ি থেকে সাত ক্রোশ দূরে এসে গতকাল বিকেলে আদরিনী অসুস্থ হয়ে আর পথ চলতে পারছে না । রাস্তার পাশে একটি আম বাগানে শুয়ে পড়েছে । তার পেটে ব্যথা হচ্ছে, সুর তুলে মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে। মাহুত যথাসাধ্য সমস্ত রাত্রি চিকিৎসা করছে, কিন্তু তাতে কোনো ফল পাওয়া যায়নি। মনে হয় আদরিনী আর বাঁচবে না। যদি মরে যায় তবে তাকে সমাধিস্থ করার জন্য কাছেই একটি জমি বন্দোবস্ত নিতে হবে। তাই করতামশাই অর্থাৎ জয়রামবাবু অবিলম্বে আশা একান্ত আবশ্যক। এই সংবাদ মাথায় বজ্রাঘাত এর মতো অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা।

**********